বেদ মানিব

কেন ?

বেদ মানিব কেন—এই কথাটী বুঝিতে হইলে বেদের কিঞ্চিৎ পরিচয়লাভ অগ্রে আবশ্যক, এজন্য সংক্ষেপে সেই বেদের পরিচয় এই—

বেদই আমাদের ধর্ম্মের মূল। বেদদ্বারাই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদায় নির্ণীত হইয়া থাকে, ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

এই বেদমধ্যে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড— এইরূপ তিনটী বিভাগ আছে, আর এতদনুসারে আমাদের ধর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মমার্গ, উপাসনামার্গ ও জ্ঞানমার্গ—এইরূপ তিনটী পথ হইয়াছে।

এই বেদ চারিখানি, যথা—ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। ইহাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদের ২১টী শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০৯টী শাখা, সামবেদের সহস্র বা মতান্তরে ১৩টী শাখা এবং অথর্ব্ববেদের ৫০টী শাখা মহর্ষি ব্যাসের শিষ্যপ্রশিষ্য-গণের সময় প্রচলিত হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের আবার দুইটী করিয়া ভাগ আছে ; যথা—একটী ভাগের নাম মন্ত্র বা সংহিতা এবং অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে উক্ত মন্ত্র বা সংহিতা ভাগের অর্থ ও প্রয়োগপ্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য ব্রাহ্মণ ভাগকে সংহিতা বা মন্ত্র ভাগের ব্যাখ্যাবিশেষ বলা হয়। উভয়ই বেদপদবাচ্য, উভয়ই অনাদি, নিত্য, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ রচিত নহে, সুতরাং ভ্রমপ্রমাদাদি পুরুষদোষবিহীন এবং উভয়ই স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ ইহাদের সত্যতা অপর প্রমাণকে অপেক্ষা করে না। বস্তুতঃ ইহাই বেদ মানিবার কারণ। এই জন্যই আমাদিগকে বেদ মানিতে হয়।

বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় প্রভৃতি বলিবার কাবণ,—বেদ অর্থবদ্ধ বর্ণাত্মক শব্দরাশি। বর্ণাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ না শিখিলে মানব তাহা স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারে না। ইহা পরীক্ষার দ্বারাও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ইটালি রাজ্যের রাজধানী রোমনগর-নির্ম্মাণকারী রুমাস ও রোমিউলাস, ভাগ্যবৈগুণ্যবশতঃ শিশুকালে অরণ্যমধ্যে এক ব্যাঘ্রীকর্ত্তৃক পালিত হন। মানবীয় ভাষা শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের ভাষাকথনযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তি হইলেও

তাঁহাদের কোন মানবীয় ভাষার স্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাঁহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় শব্দ করিতেন। মোগল সম্রাট্ আকবর দুইটী শিশুকে মনুষ্যসম্বন্ধশূন্য করিয়া পালন করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাদের কোন মানবীয় ভাষার স্ফূর্ত্তি হয় নাই। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এজন্য মানবীয় বর্ণাত্মক ভাষা না শিখিলে মানব তাহা স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারে না। হাসি-কান্না-রাগ-ভয়-প্রকাশক ধ্বন্যাত্মক ভাষা মানবের আপনাপনি বিকাশ পাইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষা না শিক্ষা করিলে আপনাপনি বিকশিত হইতে পারে না।

একটা ভাষা শিক্ষা করিবার পর মানব সেই ভাষা বিকৃত করিয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু একটা ভাষা না শিখিলে মানব তাহা করিতে পারে না।

যদি বলা যায়—মানবের বর্ণাত্মক ভাষা উচ্চারণে সামর্থ্য আছে, অপর প্রাণীর তাহা নাই, সুতরাং মনুষ্যে ইহা স্বভাব-বশেই বিকশিত হইবে?—কিন্তু এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কারণ, মনুষ্যের এই সামর্থ্য থাকিলেও, উদ্বোধকের অভাবে, সংস্কার যেমন স্মৃতিতে পরিণত হয় না, তদ্রূপ শিক্ষারূপ উদ্বোধকের অভাবে তাহার বিকাশ হয় না। পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতেই শিশু প্রথমে ভাষা

শিক্ষা করে। পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের ভাষাশ্রবণই এস্থলে উক্ত সামর্থ্যবিকাশের পক্ষে উদ্বোধক হইয়া থাকে। এই উদ্বোধকের অভাব হইলে মানবে ভাষার বিকাশ হয় না।

এজন্য পৃথিবী উৎপন্ন হইবার পর প্রথমোৎপন্ন মানবে ভাষাবিকাশের জন্য যে উদ্বোধক স্বীকার করা হয়, তাহা জগতের পিতৃমাতৃস্থানীয় কোন অনুৎপন্ন নিত্য পুরুষের ভাষা-শ্রবণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ভাষাই সেই বেদ, আর জগতের পিতৃমাতৃস্থানীয় সেই অনুৎপন্ন নিত্যপুরুষই ব্রহ্মা বা ঈশ্বর। ইনিই আদি মানবকে বেদদান করিয়া বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন। আর ঈশ্বর অনাদি নিত্য এবং সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত বেদও অনাদি নিত্য অভ্রান্ত এবং অপৌরুষেয় হয়, অর্থাৎ কোন পুরুষের বুদ্ধিকল্পিত বা রচিত নহে। সুতরাং ভ্রমপ্রমাদাদি পুরুষদোষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত।

সাধারণতঃ মনে হয়, অর্থবদ্ধ বর্ণাত্মক শব্দরাশি মনুষ্য ভিন্ন প্রথম উচ্চারিত হইতে পারে না। আর তজ্জন্য বেদ মনুষ্য-রচিত, ইত্যাদি। কিন্তু এ যুক্তি দুর্ব্বল, এ আপত্তি অমূলক। কারণ, অর্থবদ্ধ বর্ণাত্মক ভাষা মনুষ্য ভিন্ন উচ্চারিত হয় না বলিয়া তাহা মনুষ্যরচিত বলিতে হইবে কেন? উচ্চারিত হওয়া ও রচিত হওয়া ত এক কথা নহে। বস্তুতঃ ঈশ্বরই আদি মানব ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া নিত্য অরচিত বেদ

উচ্চারণ করিয়া আদিম মানব জাতিকে এই বেদদান করিয়াছেন—ইহাই বলা হয়। আর ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিলে তাঁহার পক্ষে মানবরূপ ধারণ অসম্ভবও নহে এবং যুক্তিবিরুদ্ধও নহে। বেদ মানবরূপী ঈশ্বরপ্রোক্ত, ঈশ্বররচিত নহে। মানব ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দ প্রথম উচ্চারিত হয় না বলিয়া বেদ মানবরচিত বলিবার কোন হেতুই নাই। বস্তুতঃ, বেদ ঈশ্বরপ্রোক্ত—এ কথা সেই বেদমধ্যেই আছে। সুতরাং বেদ মনুষ্যরচিত বলিবার কোন কারণ নাই।

যদি বলা হয় বেদমধ্যে বেদোৎপত্তির কথা থাকে কি করিয়া? বেদোৎপত্তির বর্ণনও কি বেদ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সৃষ্টি অনাদি, এবং প্রতিকল্পেই ভগবান্ মানবকে এইরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন বলিয়া বেদে যেমন অপর সনাতন সত্যের কথা উক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সনাতন সত্য কথাটীও কথিত হইয়াছে। যেহেতু বেদের অংশবিশেষ মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

"ব্রহ্মা হ দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব,
সঃ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ"

অর্থাৎ ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন হন, তিনি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে এই বেদ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

সুতরাং বেদমধ্যে বেদের কথা থাকে কি করিয়া—এ আপত্তি আর থাকিল না।

যদি বলা হয়, বেদমধ্যে যেমন বেদকে ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরপ্রোক্ত বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সেই বেদমধ্যে উক্ত বাক্যেই বেদের উৎপত্তির কথাও বলা হইয়াছে ; সুতরাং বেদ নিত্য হইবে। কিরূপে ? তাহার উত্তর এই যে, বেদমধ্যে বেদের উৎপত্তির কথা নাই, কিন্তু পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, কেহই কখন নিজের উৎপত্তি দেখিতে, সুতরাং বর্ণন করিতে পারে না। উৎপত্তি ও পুনরাবির্ভাব এক কথা নহে। আর বেদের উৎপত্তির কথা যদি কোথাও থাকে, ইহা স্বীকারই করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বেদ ভিন্ন গ্রন্থেই থাকিবার কথা। রচিত বেদে বেদরচনার কথা আর "বেদ" হইতে পারে না। কিন্তু বেদমধ্যেই তাদৃশ কথা রহিয়াছে বলিয়া উহা বেদের আবির্ভাববিষয়ক সনাতন সত্যের বর্ণনা-বিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনাদি সৃষ্টির প্রতিকল্পেই ভগবান্ ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া আদিম মানবকে বেদদান করেন—বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষা দেন—এই সনাতন সত্যই উক্ত বেদোৎপত্তিবোধক বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। বেদ ছিল না, উৎপন্ন হইল—একথা বলা উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। বেদের মধ্যে বেদাবির্ভাবের

কথা থাকায় বেদের পুনরাবির্ভাবের কথনই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

পক্ষান্তরে বেদমধ্যেই আছে "ব্রহ্মনিঃশ্বসিতং বেদঃ" অর্থাৎ বেদ ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার কোন প্রযত্ন আবশ্যক হয় নাই। বাক্য-রচনায় যেরূপ প্রযত্নের আবশ্যক হয়, ইহাতে সেরূপ প্রযত্ন প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং ইহা ঈশ্বরের রচিতও নহে। যাহা নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয় তাহার রচনা সম্ভব হয় না।

তৎপরে আবার আছে—"বিরূপ! নিত্যয়া বাচা" অর্থাৎ "হে বিরূপ! বেদরূপ নিত্য বাক্যের দ্বারা স্তুতি কর" ইত্যাদি। এস্থলে বেদমধ্যেই বেদবাক্যকে নিত্যই বলা হইতেছে। সুতরাং বেদের উৎপত্তিবোধক উক্ত "ব্রহ্মা হ দেবানাং" বাক্য এবং বেদের নিত্যতাবোধক উক্ত "বিরূপ! নিত্যয়া" বাক্য— এই আপাতবিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিলে ইহাই সিদ্ধ হইবে যে, বেদের উৎপত্তিবোধক উক্ত বাক্যটী বেদের পুনরাবির্ভাববোধক বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি বলা হয়—উক্ত আপাতবিরুদ্ধ বেদবাক্যদ্বয়ের এক-বাক্যতার অনুরোধে 'উৎপত্তির' অর্থ 'পুনরাবির্ভাব' না করিয়া 'নিত্যকে' আপেক্ষিক নিত্য অর্থাৎ অনিত্য বলিলে দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, উৎপত্তিকে আবির্ভাব বলিয়া

বুঝিলে উৎপত্তি ও আবির্ভাবের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, নিত্যকে অনিত্য বলিয়া বুঝিলে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না। উৎপত্তিটি পুনরাবির্ভাবের বিরোধী নহে, কিন্তু অনিত্যটি নিত্যের বিরোধীই হইয়া থাকে। সুতরাং উৎপত্তির সহিত পুনরাবির্ভাবের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, নিত্যের সহিত অনিত্যের সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় না। বুদ্ধি, আলোকরশ্মির ন্যায় সরল পথেই গমন করে, আর সরল পথই নিকট পথ। এ স্থলে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের গ্রহণই বুদ্ধির পক্ষে সরল পথে গমন। এজন্য উক্ত আপাতবিরুদ্ধ বেদবাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিতে হইলে উৎপত্তির অর্থ পুনরাবির্ভাব করাই শ্রেয়ঃ, নিত্যকে অনিত্য করা শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। অতএব বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় ইহা বেদদ্বারাই প্রমাণিত হইল।

তাহার পর বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়, তাহা যুক্তির দ্বারাও বুঝা যায়! কারণ, যে ব্রহ্মার রূপধারী ঈশ্বর বেদবক্তা, সেই ঈশ্বরকর্তৃকও বেদের রচনাই সম্ভবপর হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে রচনাই সম্ভবপর হয় না।

কারণ, বেদকে যদি ঈশ্বররচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে—বেদ রচিত হইবার পূর্ব্বে ছিল কি না? যদি "ছিল" বলা হয়, তবে আর রচনাই সম্ভবপর হয় না।

কারণ, আমরা যাহা রচনা করি, তাহা রচনার পূর্ব্বে আমরা জানি না। রচনা করিবার ইচ্ছার পূর্ব্বে তাহা আমাদের মনে ভাসমান থাকে না।

আর যদি বেদ ঈশ্বরকর্ত্তৃক রচনার পূর্ব্বে "ছিল না" বলা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, সেই বেদ ঈশ্বরকর্ত্তৃক রচনার পূর্ব্বে ঈশ্বর জানিতেন কি না ? যদি "ঈশ্বর জানিতেন" বলা হয়, তবে আর তাহার রচনা সম্ভবপর হয় না। আর যদি "ঈশ্বর জানিতেন না" বলা হয়, তবে ঈশ্বর আর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে আমাদের মত রচনা সম্ভবপর নহে। অতএব বেদ ঈশ্বরেরও রচিত নহে—ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং বেদ ঈশ্বরসম নিত্য, ঈশ্বর যেমন নিত্য বেদও তদ্রূপ নিত্য এবং অপৌরুষেয়।

যদি বলা হয়—বেদের ব্রাহ্মণভাগ, বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাবিশেষ বলিয়া ব্রাহ্মণভাগটী রচিত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হউক ? আর তাহা হইলে বেদের অংশবিশেষ পৌরুষেয় ও অনিত্যই হইল। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, অরচিত মন্ত্রভাগ যদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই শিক্ষা দেন, তবে তাহার অর্থও তাঁহাকেই শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, যে মানব প্রথমে বর্ণাত্মক শব্দোচ্চারণরূপ ভাষাই শিক্ষা করিতেছে, সে মানব নিজে নিজে তাহার অর্থ

আবিষ্কার করিবে কিরূপে ? ভাষা শিক্ষা করার অর্থই এই যে, শব্দের সহিত তাহার অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের যে সম্বন্ধ তাহারই পরিচয়লাভ করা। অতএব ব্রাহ্মণভাগও কাহারও রচিত নহে। এমন কি ঈশ্বরেরও রচিত নহে। তাহাও মন্ত্রভাগের ন্যায় অরচিত অর্থাৎ অপৌরুষের নিত্য শব্দরাশি।

যদি বলা হয় মনুষ্যরচিত রামায়ণ মহাভারতাদিও রচনার পূর্ব্বে ঈশ্বর জানিতেন, সুতরাং তাহাদের রচনাই বা কি করিয়া সম্ভাবিত হয় ? তাহার উত্তর এই যে, বেদকে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় নিত্য বলিয়া ত অরচিত বলা হইতেছে না ! উহারা বাল্মীকি ও ব্যাসের রচিত গ্রন্থ। উহাদের রচনার পূর্ব্বে ব্যাস বাল্মীকির মনে উহারা ভাসমান ছিল না। ঈশ্বরে উহারা ভাসমান ছিল, আর তাহা ব্যাস ও বাল্মীকির রচিতরূপেই ভাসমান ছিল। উহারা যখনই আবির্ভূত হইবে, তখন ব্যাস ও বাল্মীকির বুদ্ধির মধ্য দিয়াই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইবে—এইভাবেই ঈশ্বরে ছিল। সুতরাং ব্যাস ও বাল্মীকিকর্তৃক উহাদের রচনায় কোন বাধা ঘটিতে পারে না। আর তজ্জন্য বেদকে পৌরুষেয় ও অনিত্য বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আর যদি বলা হয়—ঈশ্বর যদি নূতনই কিছু না করিতে পারেন, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা আর থাকিল কোথায় ?

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে যদি তাঁহার নূতন রচনা অসম্ভব হয়, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হইল। ইহার উত্তর এই যে, এই অনন্ত জগৎ জীবাদৃষ্ট অনুসারে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত করাতে ঈশ্বরের অনন্তশক্তিমত্তা সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্তাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। জীবাদৃষ্ট অনুসারে সৃষ্টি না করিলে তাহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ ঘটিবে। আর জীবাদৃষ্ট অনুসারে সৃষ্টি করায় তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত যেমন হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রযুক্ত নূতন রচনা অসম্ভব হইলেও তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হয় না। বস্তুতঃ এরূপ আশঙ্কা করিলে বলিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর যখন নিজে নিজের বিনাশ করিতে পারেন না, তখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। কিন্তু তাহা ত বলা হয় না, অতএব সর্ব্বজ্ঞের রচনা সম্ভবপর হয় না, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

যদি বলা যায়, ঈশ্বর যে বেদের বক্তা, সেই বেদ যখন প্রতিকল্পে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হয়, তখন তাহা পূর্ব্বকল্পের মনুষ্যরচিত পূর্ব্বকল্পের শব্দরাশি হউক না কেন? মনুষ্যের অরচিত শব্দরাশিই যে তিনি কল্পারম্ভে শিক্ষা দেন—ইহা স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্যকে যখন বর্ণাত্মক শব্দরাশি শিক্ষাই করিতে হয়, শিক্ষা না করিলে যখন তাহা আপনা-আপনি বিকশিত হয় না, তখন অরচিত

কতকগুলি শব্দরাশি না স্বীকার করিলে চলিবে কেন ? মনুষ্যরচিত ভাষা স্বীকার করিতে গেলেই মনুষ্যের অরচিত ভাষা স্বীকার করা আবশ্যক হয়। নচেৎ মনুষ্য শিক্ষা করিবে কি ? শিক্ষাই ত তাহা হইলে সম্ভবপর হয় না।

যদি বলা হয়, বেদের মধ্যে যখন বক্তা শ্রোতা এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের কথা রহিয়াছে, তখন বেদ কি করিয়া অরচিত নিত্য শব্দরাশি বলিয়া স্বীকার করা যায় ? তাহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে এই বক্তা ও শ্রোতার সম্প্রদায়ের কথার মধ্যে, আজ পর্য্যন্ত যে সব বক্তা ও শ্রোতা হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সকলের স্থান হয় নাই কেন ? কেন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইতেছে না ? বেদমধ্যে বক্তা ও শ্রোতার সম্প্রদায়ের কথা কিয়দ্দূরে আসিয়া থামিয়া গেল কেন ? যেখানে থামিয়া গিয়াছে, তাহার পরও ত সম্প্রদায় চলিয়াছিল। তাঁহাদের কথা পরিত্যক্ত হইল কেন ? এজন্য এই সব কথা বেদমধ্যে যাহা আছে, তাহা অর্থবাদ, অর্থাৎ তাহা বেদের প্রামাণ্যরূপ স্তুতি প্রভৃতির জন্য। মহামুনি ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র মধ্যেই ১৪১ সংখ্যক অধিকরণে আখ্যায়িকার অর্থবাদত্ব নির্দ্দেশ করিয়া এই কথারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সম্প্রদায়ের কথা যদি বেদাতিরিক্ত বলিয়া প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বেদ মনুষ্যরচিত—এ কথা

একদিন সম্ভবপর হইত। কিন্তু ইহাও বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব বেদে বক্তা ও শ্রোতা প্রভৃতির বিষয় থাকিলেও বেদ অরচিত গ্রন্থ।

যদি বলা হয়, মহাভারতের অন্তর্গত গীতামধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন" এই বাক্যকেও গীতা বলা হয়; এইরূপ বেদবক্তার কথাও "বেদ" বলা হইয়া থাকে, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—এ কথা সঙ্গত হয় না। কারণ, গীতা মনুষ্যরচিত ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত আছে। ইহা মহাভারতে উক্তই আছে। বেদে তাহার বিপরীত কথাই নিশ্চিত। বেদের কে রচয়িতা তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই। আর এস্থলে মিথ্যা শঙ্কা করিয়া তাহাই নির্ণয় করা হইতেছে। অতএব গীতার দৃষ্টান্ত বেদানুরূপ হইল না। বিষম দৃষ্টান্ত হইলে সাধ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই আপত্তি অমূলক।

যদি বলা হয় বেদরচয়িতার পরিচয় আমাদের আজ জানা না থাকায় যদি বেদকে অরচিত বলিতে হয়, তবে লোকমুখে যেসব প্রচলিত গান গাথা বা গ্রাম্য কথাপ্রভৃতি শুনা যায়, তাহাদের রচনা-কর্ত্তার প্রসিদ্ধি না থাকায় তাহাও অরচিত বলিতে হয়? তাহা হইলে বলিব—এ কথা অসঙ্গত। কারণ, উক্ত গানগাথা প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রোক্ত বলিয়া বা অরচিত বলিয়া ত প্রসিদ্ধি হয় নাই। উহাদের রচনাকর্ত্তার বিষয়

কেবল জানা নাই—এই মাত্রই জানা আছে। ঈশ্বরপ্রোক্ত বা অরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আর রচনাকর্ত্তার বিষয় না জানা ত এক কথা নহে। বেদ কিন্তু ঈশ্বরপ্রোক্ত বা অরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে, বেদমধ্যেই এ কথা স্পষ্টভাবে উক্ত রহিয়াছে। অতএব গান ও গাথাপ্রভৃতির ন্যায় বেদ হইতে পারিল না। গানগাথার কর্ত্তৃত্ব সেই গানগাথার মধ্যে অনুক্ত এবং লোকমধ্যে বিস্মৃত, বেদের কর্ত্তৃত্বাভাবই বেদমধ্যে উক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহার কর্ত্তৃত্ব গানগাথার কর্ত্তৃত্বের ন্যায় বেদে অনুক্ত বা বিস্মৃত কর্ত্তৃত্ব নহে। অতএব গানগাথাপ্রভৃতির ন্যায় বেদেরও রচনাকর্ত্তা আছে বা ছিল—এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় বিষমদৃষ্টান্ত দোষ হইল।

যদি বলা হয়—বেদ নিজের নিত্যত্ব বা অরচিতত্ব নিজে বলিলে তাহার প্রামাণ্য কিরূপে সিদ্ধ হবে ? তাহা হইলে দুষ্ট লোকের কথায় দুষ্টকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। চার্ব্বাকগণ বেদকে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক রচিত বলিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। এ কথা মহাভারতে উক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব বেদমধ্যে বেদ ঈশ্বরপ্রোক্ত অর্থাৎ অরচিত ভাষা বলিয়া কথিত হইলেও তাহার প্রামাণ্য নাই। এরূপ প্রামাণ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ভাষা যদি শিক্ষা না

করিলে স্বতঃবিকশিত না হয়, সুতরাং প্রথমসম্ভূত মানবকে যদি ভাষা শিক্ষাই করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সময় ভাষা মানবের অজ্ঞাত ছিল, সে সময় যদি কেহ ভাষা শিক্ষা দেন, তাহা বর্ণনা করিবে কে ? এবং ভাষার অভাবে কি উপায়দ্বারাই বা তাহা বর্ণিত হইবে ?

আর ভাষা শিখিয়া কেহ পরে বর্ণনা করিলে তাহা আর বেদ হইতে পারে না। আর সে সময় অপর একজন ভাষাজ্ঞ না থাকিলে সে কথা ত আর বর্ণনা করাও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সে সময় ত অপর কেহ ভাষাজ্ঞ আর নাই। কারণ, এই সময় প্রথম মানব প্রথম এই ভাষা শিক্ষাই করিতেছে।

আর এই প্রথম শিক্ষক যদি প্রথম মানবকে বলিতেন— "আমি তোমাদের জন্য এই বেদরূপ ভাষা সৃষ্টি করিলাম" তাহা হইলে বেদের রচনা সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে বলিব, তিনি ইহা বলিবেন কিরূপে ? তাঁহাকে ভাষা শিখাইলে কে ? আর ভাষা পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে তিনি ইহা বলিতেও পারেন না। আর ঈশ্বর মানবরূপ ধারণ করিয়া যদি এই প্রথম শিক্ষকের কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ কথা বলিতেও পারেন না। কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ,

তাঁহার পক্ষে রচনা সম্ভবপরই নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এজন্য প্রতি সৃষ্টিতে প্রথম মানব যে ভাষা শিক্ষা করে, সে ভাষা যদি আত্মপরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহাকেই বলিতে হইবে যে, "আমি নিত্য অরচিত অনাদি ভাষা"। সে ভাষার পরিচয় সেই ভাষামধ্যেই থাকা আবশ্যক। তাহার পরিচয় কাহারও দ্বারা রচনা করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে না। ভাষাশিক্ষা আবশ্যক হইলেই অরচিত নিত্য ভাষা আবশ্যকই হয়। ঈশ্বরে এই অরচিত ভাষা এবং রচিত ভাষা—সকলই আছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালের, সকল ভাষাই আছে; ঈশ্বরে নাই—এমন কিছুই নাই—হইতেও পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবহিতের জন্য যদি ঈশ্বরকে মানবরূপ ধারণ করিয়া প্রথম মানবকে ভাষা শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে তিনি সেই অরচিত নিত্য ভাষা বেদই শিক্ষা দিবেন। ইহাই ত সম্ভবপর, ইহাই ত সঙ্গত। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ভাষারচনা আবশ্যক হয় না, সম্ভবপরও হয় না। আর জীবহিতের জন্য সেই অরচিত ভাষার প্রামাণ্যের পরিচয় ভাষার দ্বারা দিতে হইলে প্রথমে তাহা সেই অরচিত ভাষাই দিবে। যেহেতু জীবকে জ্ঞান দান করাই ভাষার উদ্দেশ্য, আর প্রামাণ্যবোধ না হইলে

জীবের প্রবৃত্তিই হয় না। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রোক্ত নিত্য অরচিত ভাষা যে বেদ, তাহার মধ্যেই তাহার প্রামাণ্য-জ্ঞাপনের জন্য তাহার নিত্যত্ব এবং অরচিতত্ব কথাও থাকা একান্ত আবশ্যক।

সেই ভাষাই বেদ। এই জন্য বেদমধ্যেই বেদের প্রামাণ্য এবং নিত্যত্বাদি ঘোষিত হইয়াছে। আর অন্য কোথাও অন্য কোন ভাষাতেও এভাবে নিজের নিত্যত্বাদি ঘোষিত হয় নাই। গানগাথাজাতীয় কথায় বা অন্য কোন ভাষায় কোথাও তাহা ঘোষিত হয় নাই। বস্তুতঃ, এই কারণেই বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়। এই কারণেই বেদের প্রামাণ্য অপর প্রমাণের অপেক্ষা করে না। ভাষারচনা মনুষ্যেই করে, কারণ সে সর্ব্বজ্ঞ নহে। সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা রচনা সম্ভবপর নহে। অতএব কল্পারম্ভে প্রথম মানবকে যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই শিক্ষা দেন বলিয়া, এবং সেই ভাষা মানব প্রথম শিক্ষা করে বলিয়া, তাহা অরচিত নিত্য ভাষাই হইবে। আর প্রামাণ্যবোধ ভিন্ন শিক্ষাতেও প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই ভাষায় সেই ভাষার নিত্যত্ব ও প্রামাণ্য ঘোষিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং তাহাতে নিজের নিত্যতার কথা থাকিলে তাহা আর অপ্রমাণ বা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না।

যদি বলা হয় বেদমধ্যে প্রত্যেক মন্ত্রে ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই ঋষিই সেই বেদমন্ত্রের রচয়িতা, ইহাই ত সহজে মনে হইবার কথা। সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেমন গ্রন্থকারের নাম থাকে, ইহা ত তাহাই মনে হয়। আর ঋষি শব্দের অর্থ—মন্ত্রদ্রষ্টা বা মন্ত্রশ্রোতা বা মন্ত্রলব্ধা বলা হয়। সুতরাং যে ঋষি যে সত্য উপলব্ধি করিয়া যে মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, সেই মন্ত্রে সেই ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তই ত স্বাভাবিক।

ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক মন্ত্রে যে ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতির উল্লেখ, তাহাও বেদ, তাহাও বেদমন্ত্রের অঙ্গ, তাহা বেদবহির্ভূত নহে। সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্রের প্রত্যেক ঋষি সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা হইতে পারেন না।

তাহার পর ঋষি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা হন, তবে দৃশ্যবস্তু—যেমন দর্শনক্রিয়ার পূর্ব্বে থাকে, তদ্রূপ সে মন্ত্রও পূর্ব্বে ছিল—ইহাই সিদ্ধ হয়। শ্রোতা হইলেও শ্রোতব্য মন্ত্রের অস্তিত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হয়। লব্ধা হইলেও তাহাই ঘটে।

আর ঋষি সত্য উপলব্ধি করিয়া সেই সত্য তিনি যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন সেই ভাষাই বেদ—ইহাও বলা যায় না। কারণ, সেই ঋষিকে সত্য উপলব্ধির সাধন উপদেশ করিল কে ? সিদ্ধফলপ্রদ সাধন উপদেশ করিতে

গেলে একজন সিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞকে অভ্রান্ত ভাষার দ্বারা তাহা উপদেশ করিতে হইবে। ভাষা যদি নিজে নিজে বিকশিত না হয়, তাহা যদি শিক্ষা করিয়াই লব্ধ হয়, তবে সেই ঋষি, উপলব্ধ সত্যকে অরচিত ভাষার দ্বারা প্রকাশিত করিবেন কিরূপে ? ভাষা নিজে বিকশিত হয় না ; সুতরাং তিনি ভাষা সৃষ্টি করিয়া উপলব্ধ সত্য প্রকাশ করিতে পারেন না ; আর তজ্জন্য তাঁহার ভাষাই বেদ—এ কথা বলা যায় না। তাহা বেদের অনুবাদ মাত্রই হয়, বেদের ন্যায় তাহা কতকটা হয়—এই মাত্র তাহা ঠিক বেদ হয় না।

যদি বলা যায় লৌকিক ভাষা শিক্ষা করিবার পর সাধন-বলে সত্য অনুভব করিয়া শিক্ষিত ভাষার সাহায্যে যে স্বানুভব-লব্ধ সত্যের স্বরচিত ভাষার দ্বারা প্রকাশ হয়, সেই ভাষাই বেদ বলিতে দোষ কি ? তাহার উত্তর এই যে, একটী বিষয় নানা শব্দের দ্বারা সমানভাবে বুঝান বা প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেক শব্দের অর্থমধ্যে, বিষয় এক হইলেও, কিছু না কিছু ভেদ থাকে। কৃষ্ণ নীল পীত অসিত শ্যাম সকলই কৃষ্ণকে বুঝাইলেও কিছু বিশেষ বিশেষ অর্থও সেই সঙ্গে বুঝাইয়া থাকে—ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা কোন কিছু রচনা করেন, তাঁহারা যে প্রায়ই এক একটী শব্দের পরিবর্ত্তে অপর শব্দ বসান, তাহা এই কারণেই হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রত্যেক সত্যকে অভ্রান্ত অসন্দিগ্ধ বা কেবল ভাবে প্রকাশিত করিতে গেলে নানারূপ বাক্য বা ভাষার দ্বারা তাহা করিতে পারা যায় না। নির্দ্দিষ্ট সত্যের যথার্থ প্রকাশক নির্দ্দিষ্ট ভাষাই আছে। নির্দ্দিষ্ট শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থই অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হয়। অন্য শব্দদ্বারা তাহাকে প্রকাশিত করিলে তাহাতে কিছু অন্য অর্থ মিশ্রিত হয়। এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কেহই অভ্রান্তভাবে শব্দদ্বারা কোন কোন কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না, অর্থাৎ অভ্রান্ত ভাষা শিক্ষা দিতে পারেন না। এজন্য প্রথমে যিনি ভাষা শিক্ষা দিবেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি অরচিত নিত্য ভাষাই শিক্ষা দিবেন। পরে যে ভাষা মনুষ্যের মধ্য দিয়া রচিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, সে ভাষা তিনি ব্যবহার করিবেন কেন ? সে ভাষা সেই সেই মানবই ব্যবহার করিবে। আর সেই অরচিত ভাষার মধ্যে, জীবের প্রবৃত্তির জন্য, সেই ভাষার প্রামাণ্য বা নিত্যত্বেরও পরিচয় থাকিতে বাধ্য। কারণ, প্রামাণ্যবুদ্ধি না থাকিলে জীবের প্রবৃত্তিই হয় না। ইহাই বেদ মধ্যে আছে, ইহা অন্য কুত্রাপি নাই। আর এই জন্যই বেদ নিত্য অরচিত ঈশ্বরপ্রোক্ত অভ্রান্ত অপৌরুষেয় স্বতঃ-প্রমাণ অর্থবদ্ধ শব্দরাশি বলা হয়। সাধনালব্ধ সত্যপ্রকাশক বিভিন্ন ভাষাকে বেদ বলা চলে না। তাহা বেদের ন্যায়

কতকটা কার্য্যকারী হইলেও বেদবৎ পূর্ণ কার্য্যকারী হইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন—ব্রহ্মজ্ঞের ভাষাই বেদ, তাঁহারা ঠিক্ কথা বলেন না। কারণ, তাঁহাদের মতেও দুইজন পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের ভাষার মধ্যেও ভেদ থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম এক হইলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ একই হন। কারণ, বেদ মধ্যেই আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন। সুতরাং বেদের ভাষা একইরূপ হয়।

কেহ কেহ বলেন—বেদ শব্দরাশি নহে, কিন্তু সত্য জ্ঞান-রাশি, অথবা ঈশ্বরের যে নিত্য সত্যজ্ঞান, তাহাই বেদ। তাহা শব্দ নহে। শব্দের দ্বারা কখন কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। ইক্ষুরস ও শর্করার যে মিষ্টতা শব্দদ্বারা সরস্বতীও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহা মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন। আর মহাপুরুষের স্পর্শেও জ্ঞান হয়, শব্দের তখন আবশ্যকতাই হয় না। অতএব জ্ঞানের জন্য শব্দ নিষ্প্রয়োজন, আর সেই কারণে বেদ শব্দরাশি নহে, পরন্তু জ্ঞানরাশি।

ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান যদি সাধারণভাবে দান করিতে হয়, তবে শব্দ ভিন্ন গতি নাই। ঈশ্বর যদি সৃষ্টির

আরম্ভে জীবকে জ্ঞান দান করেন, তবে তাহা শব্দদ্বারাই হইবে। মহাপুরুষের স্পর্শে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা জ্ঞানের প্রতিবন্ধকক্ষয় মাত্র। তৎপরেও শব্দের আবশ্যক হয়, তাহা অনেক স্থলে মনে মনেই সেই মহাপুরুষই প্রদান করেন। স্বপ্নে মন্ত্রলাভ ইহার দৃষ্টান্ত। আর কোন দেশে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তিরই ইহা হয়। এইরূপে উদিত জ্ঞানকেও যদি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে আবার সেই ভাষারই প্রয়োজন হইবে। আর সেই জ্ঞান যদি যথার্থভাবে প্রকাশ করিতে হয়, তবে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট শব্দেরই প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যে জ্ঞানদান করিয়া ঈশ্বর জীবনিবহের কল্যাণ সাধন করিবেন, সে জ্ঞান দীয়মান জ্ঞান বলিয়া শব্দের দ্বারাই প্রকাশ্য হয়।

আর শব্দের দ্বারা একেবারে অপ্রকাশ্য বিষয়ই নাই, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের প্রকাশক সাক্ষাৎভাবে শব্দ না হইলেও "প্রকাশ করা যায় না" বলিয়াও শব্দ তাহাকে ত প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাপুরুষ ত আর লক্ষ লক্ষ বৎসর জীবিত থাকিবেন না যে, সংস্পর্শে সকলের প্রতিবন্ধক ক্ষয় করিয়া জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দিবেন? জ্ঞানধারা চিরকাল প্রবাহিত রাখিতে হইলে শব্দেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্র যাহা বলিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় অন্য। অর্থাৎ

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলে শব্দ তাহা উৎপাদন করিতে পারে না। শব্দ অর্থের স্মারকবিশেষ। যাহার শর্করা ও মিষ্টতার ভেদের জ্ঞান আছে তাহার পক্ষে "ইক্ষুর মিষ্টতা" এই শব্দ ইক্ষুর মিষ্টতাকে বুঝাইতে পারিবে না কেন ? অতএব শব্দপ্রকাশ্য যতটুকু যে বিষয়ের সম্ভব, তাহাই শব্দ প্রকাশ করিবে। ঈশ্বরের যাবতীয় জ্ঞান বা ভাষার দ্বারা অপ্রকাশ্য জ্ঞান, বেদদ্বারা প্রকাশিত না হইলেও বেদের ন্যূনতা প্রমাণিত হয় না। আর তজ্জন্য বেদকে শব্দরাশি না বলিয়া সত্যজ্ঞান রাশি বলা যায় না।

বস্তুতঃ একমাত্র নির্গুণ নির্ব্বিশেষে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ চিৎ ও আনন্দ পদের লক্ষ্য বলিয়া এবং বাচ্য নহে বলিয়া, অনির্ব্বচনীয় বলা হয়, আর সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। নচেৎ ঘট পট ও মঠাদি যাবৎ বস্তুই শব্দবাচ্য বলা হয়। বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয় শব্দটীও শব্দই বটে। অতএব ঈশ্বরের যাবতীয় জ্ঞান বা যথার্থ সত্যজ্ঞান শব্দ-প্রকাশ্য নহে বলিয়া, বেদ শব্দনিরপেক্ষ জ্ঞানরাশি বলিবার কোন আবশ্যতা নাই। যে জ্ঞানরাশি গ্রন্থের আকার ধারণ করে বা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা শব্দরাশিই হয়, তাহা শব্দ-নিরপেক্ষ জ্ঞানরাশি হইতে পারে না। অতএব বেদ শব্দ-রাশিই বটে।

যদি বলা যায় তাহা হইলে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঋষি নামের উল্লেখের উদ্দেশ্য কি? রচয়িতার নাম উল্লেখ ভিন্ন ইহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যে মন্ত্রের যে ঋষি সেই মন্ত্রের প্রয়োগাদি, সেই ঋষির মত হইতে পারিলে পূর্ণফলপ্রদ হইবে। বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োগাদিতে অনুষ্ঠাতার আদর্শ কিরূপ হইবে, তাহাই উপদেশ করিবার জন্য সেই মন্ত্রের সঙ্গে ঋষি বিশেষের উল্লেখ। এই ঋষিচরিত্র বেদমধ্যস্থ ইতিহাসপুরাণাদিতেই উক্ত হইয়াছে। ইহা কোন্ সময়ে কোন্ ঋষি কোন্ মন্ত্র লাভ করিয়াছেন বা রচনা করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য উক্ত হয় নাই। বেদ কোন ঘটনা বিশেষের ইতিহাস নহে। বেদ সনাতন সত্যের প্রকাশক। উচ্চারণবিশেষ দ্বারা স্থুল সূক্ষ্ম শরীরে যেমন বিশেষ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ছন্দের উল্লেখ করা হয়,—ঋষির বর্ণনদ্বারাও তদ্রূপ অধিকারীর কথা বলা হয়।

যদি বলা যায়, বেদের মধ্যে যখন কাশী কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের, গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদীর, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের এবং বহু ঐতিহাসিক পুরুষের নাম প্রভৃতি রহিয়াছে, তখন ইহা কি করিয়া কোনও সময়ে মানবরচিত ভারতবর্ষের চিত্র না হইয়া নিত্য অপৌরুষের শব্দরাশি হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই যে, বেদে বিধিনিষেধের স্তুতিনিন্দার

জন্য যেমন আখ্যায়িকাসমূহ স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ উক্ত নামগুলিও সেই আখ্যায়িকার অঙ্গবিশেষ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কুরুক্ষেত্রাদি নাম বেদোক্ত নামের অনুকরণে দেশবিশেষে পরে রক্ষিত হইয়াছে বলিতে কোন বাধা হয় না। দশরথের তিন স্ত্রীর চারি পুত্র শুনিয়া যদি কেহ নিজের তিন স্ত্রীর চারি পুত্রের নাম "রাম লক্ষ্মণাদি" রক্ষা করে, তাহা হইলে তাহা কি অসম্ভব বলিতে হইবে? অথবা রামায়ণের ঘটনা এই ব্যক্তিবিশেষের পর ঘটিয়াছে বলিতে হইবে? একই দেশের নদী ও পর্ব্বতাদির যেরূপ সংস্থান, সেইরূপ সংস্থান যখন অন্য দেশেও দেখা যায়, তখন বেদের কাশী কুরুক্ষেত্রাদির অনুকরণে ভারতের স্থানবিশেষের যদি নামকরণ করা হয়, তাহা হইলে কি তাহা অসম্ভব হইয়া উঠে? অথবা বেদ কাশী কুরুক্ষেত্র হইবার পর রচিত—বলিতে হইবে? অতএব এইরূপ দেশাদির নাম দেখিয়া বেদকে মনুষ্যরচিত বলা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। বেদ কোন দেশ কাল ও পাত্র বিশেষের ঘটনাবিশেষের পরিচায়ক নহে—ইহা সনাতন সত্যের প্রকাশক।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যে অনেক অসম্ভব ও অসঙ্গত গল্পাদি আছে, জীবজন্তু জড় পদার্থ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইত্যাদি বহু অসম্ভব বিষয় আছে; এবং পরিশেষে পরস্পর-

বিরুদ্ধ কথাই বহু আছে। আর তাহাদের বেদত্ব অর্থাৎ সার্থকত্বরক্ষার জন্য মীমাংসকগণ তাহাদিগকে অর্থবাদ বলিয়া গণ্য করিয়া স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু কোন বিধি নিষেধের প্রাশস্ত্য বা নিন্দাদিবিধানার্থ বলিয়া তাহাদের পরার্থে তাৎপর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। এখন এইরূপে যে তাৎপর্য্যনির্ণয় তাহা রচনাকর্ত্তা না থাকিলে কিরূপে সম্ভবপর হয়? বক্তার অভিপ্রায়ই ত তাৎপর্য্য। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় বলা যায় কিরূপে? তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাক্যের তাৎপর্য্য থাকিলেই যে তাহা রচিত বলিতে হইবে—এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। ভাষা শিক্ষাই করিতে হয়—ইহা যখন দেখা যাইতেছে, তখন অরচিত ভাষা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্বন্ধ যদি ঈশ্বরের জ্ঞাত হয়, সুতরাং তাহা যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অন্বয়ও তদ্রূপ নিত্য হইবে। আর তাহা হইলে, সেই অন্বয়ের ঘটক যে তাৎপর্য্য তাহাও তদ্রূপ নিত্য হইবে। অতএব বাক্যের তাৎপর্য্য থাকায় যে বাক্যমাত্রেই রচিত বলিতে হইবে, তাহা সঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যে শাখাভেদে দেখা যায়—যথেষ্ট পাঠভেদ রহিয়াছে, ক্রিয়ামধ্যেও ব্যতিক্রম হইয়াছে। এইরূপ

পাঠভেদ ও ক্রিয়াভেদ মনুষ্যকর্ত্তৃক রচনারই নিদর্শন। অতএব বেদের নিত্যতা ও স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর এই যে, পাঠভেদ ও ক্রিয়াভেদবশতঃ বেদের নিত্যত্বের বা অপৌরুষেয়ত্বের অথবা স্বতঃপ্রামাণ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। বেদ আবির্ভাবের পর সম্প্রদায়-মধ্যে বিস্মৃতি ঘটিয়া এরূপ হইয়াছে—বলিলে কোন দোষ হয় না। আর ইহা যখন বেদব্যাসের ন্যায় অবতার পুরুষও মান্য করিয়াছেন, তখন আজ আমাদের মধ্যে সে আশঙ্কা বাহুল্যবিশেষ। আল্লোপনিষৎ, চৈতন্যোপনিষৎ, খৃষ্টোপনিষৎ এবং রামকৃষ্ণোপনিষৎ প্রভৃতি নূতন নূতন উপ-নিষৎ দেখিয়া আসল উপনিষদেও সংশয় জন্মান স্বাভাবিক বটে। এজন্য যে সকল উপনিষদের শাখা আছে, তাহাদের প্রামাণ্যে কোন সংশয় হওয়া উচিত হয় না। আচার্য্যগণও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—যিনি প্রথমে মানবকে ভাষা শিক্ষা দিবেন, তিনি কেন অল্পজ্ঞই হউন না? তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? অনাদি সৃষ্টিতে অনাদি অল্পজ্ঞ যে জীব, পৃথিবীতে প্রথমোৎপন্ন হইয়াছিল সেই ব্যক্তিই অপর মানবকে শিক্ষা দিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ প্রথম শিক্ষক স্বীকারের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, তবে না শিখিয়াই ভাষার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে ! কিন্তু না শিখিয়া ত বর্ণাত্মক ভাষার স্ফূর্ত্তি হয় না। ইহা ত পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়। আর— অল্পজ্ঞ ব্যক্তি অল্প বিষয় জানিল কিরূপে ? ভাষা ত নিজে নিজে স্ফূর্ত্তি পায় না ! যে জানাইয়াছে সেও অল্পজ্ঞ হইলে তাহাকে জানাইল কে ? এইরূপে দেখা যায়—অজ্ঞকে যে ব্যক্তি অল্পজ্ঞ করেন সে ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞই বলিতে হইবে। অল্পজ্ঞ অনাদি হইলে সর্ব্বজ্ঞও অনাদি হইবেন, অল্পজ্ঞ থাকিলেই সর্ব্বজ্ঞ থাকিবেন, "জ্ঞ" না স্বীকার করিলে অল্পজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ হয় না। আর "জ্ঞ" ও সর্ব্বজ্ঞ একই কথা হইয়া পড়ে। সীমাবদ্ধ কিছু করিতে গেলেই অসীম স্বীকার স্বাভাবিক হয়।

আর যদি বলা হয়, ঈশ্বর স্বীকার করিব কেন ? সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ স্বীকারও নিষ্প্রয়োজন হয় ? তাহা হইলে তাহার এক কথায় উত্তর এই যে, জীব ও জগৎ আছে বলিয়া যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাদের সমষ্টিও আছে—স্বীকার করিতে হইবে। ব্যষ্টি থাকিলেই সমষ্টি থাকিবে। বহু থাকিলেই এক থাকিবে। বহুর মধ্যে এক আছে বলিয়া সমগ্র বহুতে একত্ববুদ্ধিও স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, অবয়ব হইতে অবয়বী যেমন অতিরিক্ত, তদ্রূপ ব্যষ্টির যাহা সমষ্টি, তাহা

অতিরিক্তই হয়—তাহাতে ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত কিছু ধর্ম্ম থাকেই থাকে। সমষ্টি ব্যষ্টিনিষ্ঠ হইলেও সমষ্টিতে ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত ধর্ম্ম থাকে। এই কারণে জীবের অল্পজ্ঞান ও অল্প-শক্তি যেমন আছে, জীবসমষ্টি ঈশ্বরে তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্ব-শক্তি অবশ্যই থাকিবে। ঈশ্বর স্বীকারে নানা যুক্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করা এ স্থলে লক্ষ্য নহে।

এই ঈশ্বর ব্রহ্মার রূপে আদি মানবরূপ ধারণ করিয়া বেদদান করিয়াছেন, এই কারণেই বেদ কাহারও রচিত নহে, বেদ পৌরুষেয় নহে; বেদ নিত্য, বেদ ঈশ্বরসমান নিত্য। আর সেই বেদমধ্যেই বেদের নিত্যতাপ্রভৃতি জ্ঞাপিত হওয়ায় বেদ স্বতঃপ্রমাণ, বেদ অন্যপ্রমাণনিরপেক্ষ সত্য। যাহা অন্যপ্রমাণদ্বারা, বেদ না জানিয়াও জানা যায়, তাহা বেদ উপদেশ করে না। তাহা হইলে আর বেদের প্রামাণ্য থাকে না। বেদ তাহা হইলে অনুবাদ হইয়া যায়। যাহা বেদ উপদেশ করে, তাহা একমাত্র বেদ দ্বারাই জ্ঞেয়। অন্য প্রমাণ তাহার সহায়তা পর্য্যন্ত করিতে পারে। যেমন দেবতার কথা, বেদ হইতে জানিয়া সাধনবলে যখন তাঁহাদের দর্শনলাভ হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সহায়তার জন্য আবশ্যক হয়—এইমাত্র। অসঙ্গ ব্রহ্ম বেদৈক-মাত্র জ্ঞেয়। স্বাধীনভাবে অনুমানাদি তাহা জানাইতে পারে না।

আর এই বেদ আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের মূল বলিয়া আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারাই প্রকৃত নিঃশ্রেয়সলাভ অবশ্যম্ভাবী। অল্পজ্ঞ মানবকল্পিত পথে প্রকৃত নিঃশ্রেয়স লাভ কখনই সম্ভবপর নহে। যাঁহারা সাধনবলে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মান্তর নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদেরও মূল পরম্পরাসম্বন্ধে এই বেদ বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপথেও কতকটা শান্তিপ্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের যথার্থ নিঃশ্রেয়সলাভে ইচ্ছা, তাঁহাদের এই বেদ ভিন্ন গতি নাই। ২১. ৫৫৬

ইহার কারণ, প্রকৃত নিঃশ্রেয়সমধ্যে কখন তারতম্য থাকিতে পারে না, উহা নির্ব্বিশেষ হইতে বাধ্য। উহা অদ্বৈততত্ত্বই হইয়া থাকে। দ্বৈততত্ত্ব তারতম্যরহিত হইতে পারে না, নিঃশ্রেয়স হইতে পারে না। কারণ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তাহাই নিঃশ্রেয়স, সুতরাং যাহার স্থায়িত্ব, যাহার প্রকাশত্ব, এবং যাহার প্রিয়ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাই ত নিঃশ্রেয়স হইতেছে। আর সেই হেতু যাহা অদ্বৈত ও সৎ চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ, তাহাই নিঃশ্রেয়স। অন্য কিছু অল্পসৎ অল্পচিৎ ও অল্পানন্দ হইলে আর নিত্য হইল না। অল্প সতের নামই ত অনিত্য বা মিথ্যা। সুতরাং যাহা নিঃশ্রেয়স তাহা অদ্বৈতই হয়—তাহা নিত্যই হয়।

এই নিঃশ্রেয়সস্বরূপ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্ব একমাত্র

বেদমধ্যেই আছে, অন্য কুত্রাপি নাই। অন্যত্র স্বীকার করিবার ইচ্ছা যদি হয়, তবে তাহা বেদের পরবর্ত্তী ও বেদের পরে প্রকাশিত বলিয়া তাহা বেদেরই ছায়াবিশেষ এবং তাহা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদ হইতেই লব্ধ বলিতে হইবে। আর বেদ যে আদিভাষা তাহা বেদই বলে, এবং ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনভাষা, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। আর একই অর্থ একই শব্দে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যশব্দদ্বারা যথার্থভাবে তাহা প্রকাশিত হয় না, এজন্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রোক্ত অরচিত নিত্য স্বতঃপ্রমাণ বেদদ্বারাই যথার্থ নিঃশ্রেয়স লাভ হইবার কথা। অন্য ভাষার দ্বারা বা অন্য ব্যক্তির দ্বারা, অথবা বেদোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের দ্বারা সেই যথার্থ নিঃশ্রেয়স কখনই লভ্য হইতে পারে না। যথার্থ নিঃশ্রেয়সজ্ঞাপক ভাষা একটীই হইবে, তাহা অরচিত ভাষাই হইবে, তাহা ঈশ্বরের ভাষাই হইবে, আর তাহা বেদই হইবে। যিনি সাধনবলে সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব লাভ করিবেন, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন নহেন বলিয়া তাঁহার ভাষা বেদেরই ভাষা হয়, ঈশ্বরেরই ভাষা হয়। সুতরাং বেদোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মদ্বারা যথার্থ নিঃশ্রেয়সলাভ অসম্ভব।

আর এই কারণেই বেদ মানিতে হয়, বেদ না মানিলে আর

গতি নাই। অন্ত কথায়, যদি অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে ইচ্ছা হয় ত বেদ মানিতে হইবে। যদি ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হয় ত বেদ মানিতে হইবে। যদি যাহা অপেক্ষা ভাল আর নাই —এতাদৃশ নিঃশ্রেয়স মুক্তি লাভ করিতে বাসনা হয় ত বেদ মানিতে হইবে। অধিক কি যদি অলৌকিক উপায়ে অভ্যুদয় কামনা হয়,তাহা হইলেও বেদ মানিতে হইবে। লৌকিক উপায় যে সর্ব্বক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় না, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যুক্তি তর্কে ও বিজ্ঞানে যে অসঙ্গ ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হয় না তাহা কাহার অজ্ঞাত ? বস্তুতঃ এইরূপ নানা কারণে বেদ ভিন্ন গতি নাই, বেদ মানিতেই হয়।

294.1/GHO/B
21666